সরকারি অর্থব্যবস্থা

Public Finance

ইউনিট ৯

ভূমিকা

বিভিন্ন অর্থব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয়। ক্লাসিক্যাল আমলে ধারণা করা হতো, সেই সরকারই উত্তম যে ব্যয় কম করে। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো। এখন সেই সরকারই উত্তম যে ব্যয় বেশি করে। কারণ উন্নয়নের পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সরকার কর্তৃক ব্যয়। সরকার সেই ব্যয় কিভাবে করবে, কোন কোন উৎস হতে আয় অর্জন করবে, কোন কোন খাতে অর্জিত রাজস্ব ব্যয় করবে ইত্যাদির বিশদ বিবরণ সরকারি অর্থব্যবস্থায় স্থান পায়। কাজেই সরকারি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা বাঞ্ছনীয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৯.১ : সরকারি অর্থ ব্যবস্থার ধারণা

পাঠ ৯.২ : সরকারি ব্যয়

পাঠ ৯.৩ : সরকারি আয়

পাঠ ৯.৪ : কর ব্যবস্থা

পাঠ ৯.৫ : বাজেট ঘাটতি এবং সরকারি ঋণ

পাঠ ৯.১ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার ধারণা
Concept of Public Finance

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত ও ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সরকারি অর্থব্যবস্থঅ ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।

মূলপাঠ

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের এক একটি অর্থ ব্যবস্থা রয়েছে তাদের অর্থনীতি পরিচালনার জন্য। সরকারি অর্থ ব্যবস্থা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কি তা সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হতে জানা যায়। সরকারি অর্থ ব্যবস্থা অর্থনীতির সেই অংশ যা সরকারের আয় ও ব্যয় মূল্যায়ণ করে এবং আয়-ব্যয়ের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য প্রভাব বিশ্লেষণ করে।

অর্থনীতিবিদ মাসগ্রেভ এর মতে, "যে সকল জটিল সমস্যা সরকারের আয়-ব্যয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাকে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হলে।"

অধ্যাপক বাস্টেবল বলেন, "সরকারি অর্থ ব্যবস্থা অর্থনীতির একটি শাখা যা সরকারি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় এবং আর্থিক প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের সম্পর্ক কেমন হবে তা আলোচনা করে; যা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পর্কিত সকল কাঠামোকে অন্তর্ভূক্ত করে।"

ডাল্টনের মতে, "সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারের আয় ও ব্যয় এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্পর্কে আলোচনা করে।" উপরোক্ত সংজ্ঞা সমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সরকার একটি দেশের মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধণের জন্য এবং সামাজিক অর্থনীতির লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য কোন খাতে কত টাকা, কিভাবে এবং কোন কোন নীতি অনুসরণ করে ব্যয় করবে তা সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

সরকারি ও ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থার পার্থক্য

ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা তথা আয়-ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা হলো ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা। আর সরকারের আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা তথা আয়-ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হলো সরকারি অর্থব্যবস্থা। নিম্নে ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থঅ ও সরকারি অর্থব্যবস্থার পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো−

১। আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি: ব্যক্তি আয় বুঝে ব্যয় করে। ব্যক্তির আয় কম হলে ব্যয় কম করে আবার আয় বেশি হলে ব্যয়ও বেশি করে। অর্থাৎ ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু সরকার ব্যয় অনুযায়ী আয় করে। সরকার তার ব্যয়ের খাত এবং ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে তারপর প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করে।

২। বাজেট: ব্যক্তিগত বাজেট সাধারণত উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে। কারণ ব্যক্তির জন্য উদ্বৃত্ত বাজেট কল্যাণকর, ঘাটতি বাজেট নয়। কিন্তু সরকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘাটতি বাজেট করে থাকে। যদিও সরকারের জন্য উদ্বৃত্ত বাজেট ভাল। কিন্তু তা যদি জনগণের সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যাগ করে করা হয় তবে তা সমর্থনযোগ্য নয়।

৩। ঋণের উৎস: ব্যক্তির ঋণের উৎস সীমাবদ্ধ। ব্যক্তি অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন- আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহাজন প্রভৃতি উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে থাকে। অপরদিকে সরকারের ঋণের উৎস ব্যপক। সরকার দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।
৪। আয়ের নমনীয়তা: ব্যক্তির আয় নির্দিষ্ট থাকে। যেমন- চাকুরীর বেতন-ভাতা, ব্যবসায়ের নিয়মিত মুনাফা ইত্যাদি। অপরদিকে সরকারের আয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো কমানো যায়।
৫। নোট ইস্যু করা: ব্যক্তি কখনো নোট ছাপাতে পারে না। কিন্তু সরকার নোট ছাপানোর মাধ্যমে আয় অর্জন করতে পারে।
৬। গোপনীয়তা: ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব গোপনীয় থাকে। হিসাব দেখাতেও ব্যক্তি বাধ্য নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বাধ্য করতে পারে। অপরদিকে সরকার তার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করে। বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, পত্রিকা, ওয়েবসাইট, ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার তার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করে থাকে।
৭। আয়-ব্যয়ের উদ্দেশ্য: ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের লক্ষ্য মুনাফা অর্জন বা আয় বৃদ্ধি করা। ব্যক্তি তার পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণের চিন্তা করে ব্যয় করে। অন্যদিকে সরকার সামাজিক কল্যান তথা সকল নাগরিকের কল্যানের জন্য ব্যয় করে।
৮। আয়-ব্যয়ের সময়: ব্যক্তি সাধারণত সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে আয় ব্যয়ের সমন্বয় করে থাকে। আর সরকার সাধারণত এক বৎসর বা পাঁচ বৎসর সময় মেয়াদের জন্য আয়-ব্যয়ের সমন্বয় করে থাকে।
সুতরাং বলা যায় বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিগত ও সরকারি অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে যেকোন দেশের অর্থনীতি পরিচালনার জন্য দক্ষ সরকারি অর্থ ব্যবস্থা অপরিহার্য। একটি দেশের সরকারি অর্থব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ঐ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা তথা অর্থনৈতিক কল্যান।
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সরকারি আয়-ব্যয় তথা সরকারি অর্থ ব্যবস্থার তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। তখন ভাবা হতো, যে সরকার অর্থনীতিতে কম ব্যয় করে কম আয় করে সে সরকারই উত্তম। সরকার অর্থনীতিতে যত কম হস্তক্ষেপ করবে ততই মঙ্গল। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা ভিন্ন। এখন অনেকটা বলা যায়, যে সরকার বেশী আয়-ব্যয় করে সেই সরকারই উন্নয়ন বান্ধব। তাই পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশই বর্তমানে ঘাটতি বাজেট করে থাকে; যেখানে, সরকার আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশী করে। এক্ষেত্রে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার প্রচুর ব্যয় করে থাকে। এসকল খাতে সরকারি ব্যয় ছাড়া উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব।
Adam Smith যখন অদৃশ্য হাত ধারণার কথা বলেন তখন বলা হয় বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ বণ্টন হতে পারে, সরকারি হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন নাই। তখন কিছু অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ না করে ববং মুক্ত বাজার নীতি বজায় রাখা উচিত। এ ধারণা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আংশিকভাবে কার্যকর ছিল যা বলবৎ ছিল। কিন্তু অন্যদিকে কিছু অর্থনীতিবিদ এ বক্তব্যের বিপক্ষে ছিলেন। তাদের মতে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ হতে পারে না তথা সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারা বলেন যে, উৎকৃষ্ট প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি। কাজেই সরকারি অর্থ ব্যবস্থা ছাড়া বর্তমানে কোন দেশের অর্থনীতি সক্রিয় তথা প্রত্যাশিত অবস্থানে থাকতে পারে না। তাই সরকারি অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ গুলো আলোচনা করা যাক। যার মাধ্যমে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব ফটে উঠবে।

১। **সামাজিক কারণ :** সমাজে কতগুলো বিষয় যেমন প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।

২। **কর আরোপের মাধ্যমে ক্ষতিকর দ্রব্যকে নিরুৎসাহিত করা:** কতগুলো দ্রব্য আছে যা মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর যেমন: সিগারেট, এলকোহল, অপিয়াম ইত্যাদি। সরকার এসব পণ্যের উপর করা বা লেভী আরোপ করে এসবের ভোগ ও উৎপাদন নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব বাড়তে পারে।

৩। **শিশু শিল্প সংরক্ষণ :** উন্নয়নশীল দেশের শিশু শিল্পগুলো অর্থাৎ নতুন গড়ে ওঠা শিল্প গুলো উন্নত দেশের প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে পারে না। সরকার এসব উঠতি শিল্পের বিকাশের জন্য এসব শিল্পের প্রতিযোগী দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ করতে পারে।

৪। **পণ্য দ্রব্যের সরবরাহ :** সরকার দেশের জনগণকে পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করে থাকে। যেমন, রাস্তা, ব্রিজ, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি। সরকারি অর্থব্যবস্থা এসবের নিশ্চয়তা প্রদান করে দেশের মানুষের কল্যাণ তথ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে।

৫। **আয়ের পুণ:বণ্টন :** সরকার দেশের ধনী শ্রেনীর উপর কর আরোপ করে দরিদ্র শ্রেনীর জন্য আয় সৃষ্টিকারি উপাদান বৃদ্ধি তথা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পারে।

৬। **সমতা:** সরকারি অর্থব্যবস্থা আয়ের অসমতা দূর করে ধনী দরিদ্র ব্যবধান কমিয়ে আনে যার ফলে সুষম আয় তথা উন্নয়ন হয়। সরকার ধনী শ্রেনীর উপর অধিক হারে কর আরোপ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে পারে। যেমন-খাদ্যে ভর্তূকী, ফ্রি-মেডিকেল সহায়তা, গৃহায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি।

৭। **ভর্তূকী ও বিশেষ বরাদ্দ :** আবুনিক্কানের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা খাতে ভর্তূকী ও বরাদ্দ অনিবার্য হয়ে দাড়িয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনগনের প্রয়োজনে সরকার জ্বালানী তেল ও পরিবহন খাতে প্রচুর ব্যয় করে থাকে।

৮। **সম্পদের কাম্য ব্যবহার :** সরকার উপযুক্ত বাজেট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে যা সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৯। **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :** সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। যেমন: পঞ্চবার্ষিক, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা করে সম্পদ, কর ও সরকারি ঋনের সঠিক সমন্বয় সাধন করে থাকে।

১০। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** সরকার দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ ও জনগনের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করে থাকে। যেমন: সরকারি কল-কারখানা, সরকারি ই-পিজেড, সরকারি পূর্ত কাজ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ

১। সরকারি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে জানবেন।
২। বিভিন্ন সরকারি আর্থিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষন করে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন।

সারসংক্ষেপ

- সরকারি অর্থব্যবস্থা সরকারের আয়-ব্যয় এবং তাদের সমন্বয় সাধন সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান দান করে। সরকারি অর্থব্যবস্থায় গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যপক। এটি ছাড়া একটি রাষ্ট্র অচল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচ্য বিষয় কোনটি?
ক) সরকারি সঞ্চয় ও বিনিয়োগ খ) সরকারি ব্যয় গ) সরকারি আয়-ব্যয় ঘ) সরকারি ক্রয়

২। অদৃশ্য হাত ধারণার প্রবক্তা কে?
ক) মার্শাল খ) রবিন্স গ) পিগু ঘ) এডাম স্মীথ

৩। কোনটি গণদ্রব্য?
ক) শার্ট খ) রুই মাছ গ) জমি ঘ) রাস্তা

৪। সরকার বর্তমানে কোন ধরনের বাজেট প্রণয়ন করে থাকে?
ক) সুষম খ) উদ্বৃত্ত গ) ঘাটতি ঘ) কোনটিই না।

৫। ইপিজেড কি?
ক) আমদানী বিপণন নীতি খ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল
গ) রপ্তানী বৃদ্ধি প্রকল্প ঘ) রপ্তানী সম্প্রসারণ এলাকা।

পাঠ ৯.২ সরকারি ব্যয়
Government Expenditure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সরকারি ব্যয় কি ও সরকারি ব্যয় বিন্যাস কিরূপ তা জানতে পারবেন;
- সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহ জানতে পারবেন;
- সরকারি ব্যয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয় বলতে সরকারি ক্রয় ও বিনিয়োগকে বুঝায়। যেমন: সরকার জনগনের স্বার্থে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে, বিনিয়োগ করে, হস্তান্তর করে, জনগনের সামাজিক সুবিধার জন্য পেনশন ভাতা ইত্যাদি প্রদান করে। সরকার জনগণের নিরাপত্তা, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। অর্থাৎ একটি দেশের জনগনের আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য ঐ দেশের সরকার যে ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাদের GDP এর ৩৮% ব্যয় করে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালে ৪৭৮১৭৩ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করে এবং ২০১৫ সালে ৪৩১৯২১ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করে (BBS)

সরকারি ব্যয়ের শ্রেণীবিন্যাস

সরকারি ব্যয় অনেক উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সরকার বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যয়ের খাত উল্লেখ করে। এসবের উপর ভিত্তি করে সরকারি ব্যয়ের শ্রেনীবিন্যাস নিম্নরূপ হয়:-

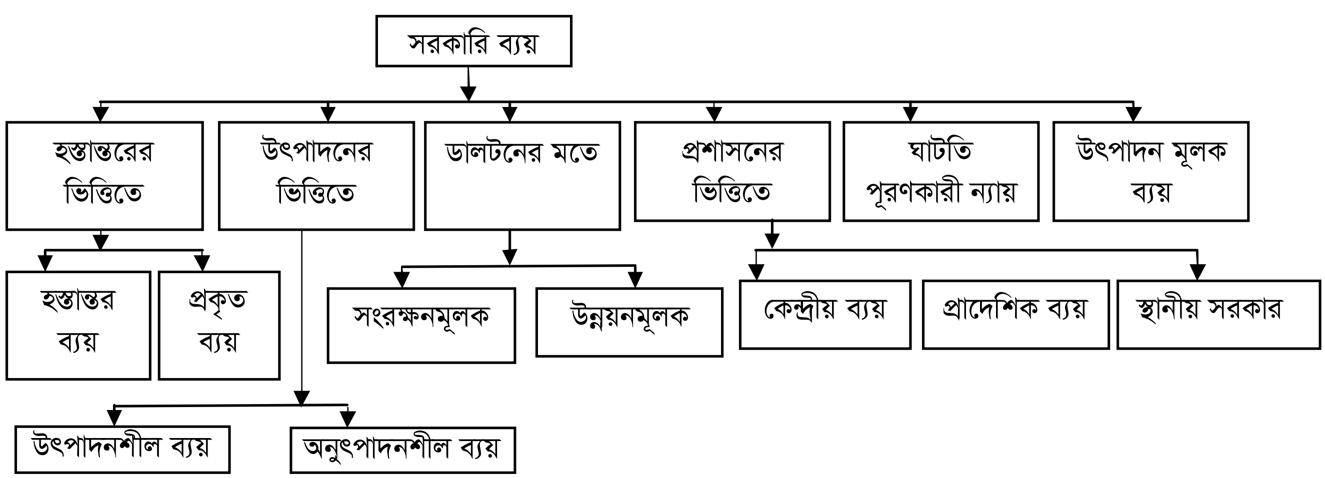

এসব উপারের শ্রেণীবিন্যাসগুলো আলোচনা করা যাক–

প্রথমে হস্তান্তরের ভিত্তিতে সরকারি ব্যয়কে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি হস্তান্তর ব্যয় অন্যটি প্রকৃত ব্যয়।

সরকার সরকারি ঋণের সুদ প্রদান করে থাকে। আবার সরকারি ঋণের পরিশোধ করতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই ব্যয়ের সাথে ঋণ দাতাদের নিকট কেবল অর্থ হস্তান্তর হয় মাত্র। এই ব্যয় হস্তান্তর ব্যয়। যখন যুদ্ধ হয় বা বন্যা হয় তখন

সরকার জনগণের জন্য যে ব্যয় করে থাকে তাকে প্রকৃত ব্যয় বলে। কারণ এক্ষেত্রে অর্থ বা সম্পদের উপভোগ সম্পূর্ণ নিংশেষ হয়ে যায়।

আবার উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে সরকারি ব্যয় দুই প্রকার- উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল। বিভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি খাতে ব্যয় করে ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি সম্ভব। তাই এগুলো উৎপাদনশীল খাত। অন্যদিকে যেসকল খাতে সরকারি ব্যয় করলে ভবিষ্যাতে আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না সেগুলো অনুৎপাদনশীল খাত। যেমন- যুদ্ধের ব্যয়, শরনার্থীর জন্য ব্যয় (রোহিঙ্গাদের জন্য সরকারি ব্যয়) ইত্যাদি।

অধ্যাপক ডালটনের মতে, সরকারি ব্যয় সংরক্ষণ মূলক হতে পারে আবার উন্নয়নমূলক হতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এবং বহি:শত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যয় হয় তাই সংরক্ষণ ব্যয়। যেমন-পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, জেল বিভাগ ইত্যাদির জন্য সরকার প্রচুর ব্যয় করে থাকে। আবার দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় যা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ সরকার দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। সরকারের ব্যয়ের খাত গুলোকে প্রধানত দুভাগে করা যায়। যথা- ক) রাজস্ব ব্যয় ও খ) উন্নয়ন ব্যয়। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো আলোচনা করা হলো:-

ক) রাজস্ব ব্যয় : সরকার তথা রাস্ট্রের সবোর্চ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য যে ব্যয় হয় তা রাজস্ব ব্যয়। বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের খাতগুলো নিম্নরূপ:

১. **সেবা ও প্রশাসন :** রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নিবার্চন কমিশন, লোক প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চলতি ব্যয় এ খাতের অন্তর্ভূক্ত। ২০১৬-২০১৭ সালের বাজেটে এই খাতে ৪৭২৭৩ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে।

২. **স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন :** স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় এ খাতের অন্তর্ভূক্ত। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে ২৩৫৩৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছে।

৩. **প্রতিরক্ষা :** দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সরকারে মৌলিক দায়িত্ব। তাই বহি:শত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সরকার প্রতিরক্ষা খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে ২২১৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছে।

৪. **জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা :** বাংলাদেশ সরকার আইন শৃংখলা রক্ষা ও জনগনের আভ্যন্তরীন জানমালের নিরাপত্তার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে এ ব্যয়ের পরিমান ছিল ২১০৮৩ কোটি টাকা।

৫. **শিক্ষা ও প্রযুক্তি :** শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। সরকার এটি মাথায় রেখে দেশের নাগরিকদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এবং পাশাপাশি প্রযুক্তির সম্প্রসারণে এ খাতে ব্যয় করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতে ৫২৯১৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ দেয়।

৬. **স্বাস্থ্য :** স্বাস্থ্যই সম্পদ। দেশের জনগনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার এ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে ১৭৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করে।

৭. **সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ :** সরকার দেশের জনগনকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যেমন: মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি। এ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৯৮৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে।

৮. **গৃহায়ন :** দেশের নাগরিকদের গৃহায়ন নিশ্চিত করার তথ্য সরকার প্রতি বছর এ খাতে অর্থ ব্যয় করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ খাতে ৩১১৮ কোটি টাকা ব্যয় করে।

৯. **কৃষি :** সরকার কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কৃষি খাতে সরকার ২২৭০৮ কোটি টাকা ব্যয় করে।

১০. **শিল্প খাত ও অর্থনৈতিক সেবা :** দেশকে শিল্পোন্নত করার জন্য সরকার শিল্প কল-কারখানা স্থাপন ও যোগাযোগের লক্ষ্যে এ খাত অর্থ ব্যয় করে। ২০১৬-১৭ অর্থ বচরে ৩৫৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করে।

১১. পরিবহন ও যোগাযোগ : সরকার দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩৭২৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন–
ক) সরকারি ব্যয়ের সংজ্ঞা এবং খাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিবেন।
খ) সরকারি ব্যয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

- একটি দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য তথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। বর্তমানে সরকারি ব্যয় ছাড়া কোন দেশ প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অবকাঠামো কত প্রকার?
ক) ৩ খ) ৪ গ) ২ ঘ) ৫

২। কোনটি অনুৎপাদনশীল ব্যয়?
ক) শিক্ষার জন্য ব্যয় খ) স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় গ) শরণার্থীর জন্য ব্যয় ঘ) আইন-শৃংখলা রক্ষায় ব্যয়

৩। সরকারি ব্যয়ের খাত প্রধানত কত প্রকার?
ক) ৩ খ) ২ গ) ৫ ঘ) ৭

পাঠ ৯.৩ সরকারি আয়
Government Revenue

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সরকারি আয় বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন;
- সরকারি আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ সম্পর্কে ধারণা;
- সরকারি আয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

সরকারি আয়ের সংজ্ঞা :
সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের জনগনের উপর কর ধার্য করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে সরকারি আয় বলে। ব্যক্তি যেমন তার কতগুলো প্রচলিত ও অপ্রচলিত উৎস হতে আয় সংগ্রহ করে সরকারও তার উৎসসমূহ হতে আয় সংগ্রহ তথা অর্জন করে। ব্যক্তির আয়ের সাথে সরকারের আয়ের পার্থক্য অনেক। সরকার তার ব্যয় নির্ধারণ করে আয় উপর্জনের প্রয়াস চালায়।

সরকারি আয়ের উৎস সমূহ :
সরকারি আয়ের উৎস সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

১. কর হতে আয়
২. কর বহির্ভূত আয়

সরকার জনগনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপের মাধ্যমে যে রাজস্ব সংগ্রহ করে তাকে কর হতে আয় বলে। অপরদিকে কর ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আদায় ও অর্থ হতে যে আয় হয় তাকে কর বহির্ভূত আয় বলে।
প্রথমে কর হতে আয় বা কর আয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তার পূর্বে কর কি তা বুঝা জরুরি একটি দেশের জনগন সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন প্রকার সুবিধা প্রত্যাশা ব্যতীত সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। সরকারী রাজস্বের বৃহত্তম অংশ কর হতে গৃহীত। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় সরকারি আয়ের উৎস হিসেবে করের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের উন্নয়ন তথা বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারি আয় বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটে কর হতে আয় ছিল ১৫৫৪০০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে কর হতে আয় ছিল ২১০৪০২ কোটি টাকা।
সরকারের কর হতে আয়ের মধ্যে আয়কর, মুনাফা কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানী রপ্তানী শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, আবগারী শুল্ক, স্ট্যাম্প, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, পরিবহন কর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এবার কর বহির্ভূত আয় গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। কর ছাড়া সরকার যেসব উৎস হতে আয় বা রাজস্ব সংগ্রহ করে তাকে কর বহির্ভূত আয় বলে। এ উৎস যেসব খাতকে অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলো হলো ডিভিডেন্ড ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক আয়কর ও ফি, জরিমানা, বানিজ্যিক আয়, সরকারি সম্পত্তি থেকে আয়, জরুরী অবস্থায় সরকারি ঋণ, প্রতিরক্ষা খাত হতে আয় ইত্যাদি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বাজেটে কর বহির্ভূত আয় ছিল ২২০০০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে এ উৎস হতে আয় হয় ৩২৩৫০ কোটি টাকা।

নিম্নে সরকারি আয়ের কর বহির্ভূত আয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **মুনাফা ও লভ্যাংশ :** সরকারি শিল্প কারখানার তথা কোম্পানী সমূহের মুনাফা ও লভ্যাংশ থেকে সরকারের প্রচুর আয় হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ উৎস হতে ৭৯২২ কোটি টাকা অর্জিত হয়।

২. **সুদ :** সরকার অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদিকে ঋণ প্রদান করে থাকে। এসব ঋণের সুদ থেকে আয় হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ উৎস হতে ৮০০ কোটি টাকা আয় অর্জিত হয়।

৩. **ফি :** কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোন সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে তার নিকট থেকে যে অর্থ সরকার আদায় করে তাই ফি। যেমনঃ কোট ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ উৎস হতে ৪৮৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

৪. **জরিমানা :** সরকার আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের কাছ থেকে শাস্তিস্বরূপ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ আদায় করে তাই জরিমানা। জরিমানা করের মতোই বাধ্যতামূলক। তবে কেবল অপরাধির ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ উৎস হতে ৩৫৬ কোটি টাকা আদায় হয়।

৫. **সরকারি সম্পত্তি :** দেশের বিভিন্ন জায়গা প্রচুর সরকারি সম্পত্তি রয়েছে যেমন-খাল, বিল, নদী, বন , সরকারি খাস জমি ইত্যাদি লীজ দিয়ে সরকার প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ উৎস হতে সরকার ১২৯ কোটি টাকা আয় করে।

৬. **টোল ও লেভী :** সরকার নির্মিত বিভিন্ন সেতু ও নির্মাণ হতে টোল আদায় করে থাকে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে লেভী আরোপ করে থাকে। এ উৎস হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সরকার ৭৫৮ কোটি টাকা আয় করে।

৭. **বাণিজ্যিক আয় :** সরকারি বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেমন- রেল বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি উৎস হতে যে আয় হয় তাই বাণিজ্যিক আয়।

৮. **বিশেষ কর :** কোন এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ যেমন- রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস তথা অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে ঐ এলাকার জমির দাম ছেড়ে যায়। এটি ঐ এলাকার অনুপর্জিত আয়। এ আয় বৃদ্ধিতে এলাকার জনগনের কোন অবদান নেই। এক্ষেত্রে যেসব লোক বা প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে লাভবান হয় তাদের উপর সরকার বিশেষ কর আরোপের মাধ্যমে আয় উপার্জন করে।

৯. **বিবিধ :** সরকার অনেক সময় ক্ষতিপূরণ, পুরস্কার এবং বৈদেশিক সাহায্য হতে অনেক আয় করে।

সরকারি আয়ের প্রয়োজনীয়তা :

বর্তমান বিশ্বে সেই সরকারই ভাল যে বেশী ব্যয় করে। পূর্বে ধারণা ছিল উল্টো। কাজেই আয় না হলে ব্যয় সম্ভব নয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণতঃ ঘাটতি বাজেট করে থাকে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। তবে প্রত্যেকটি দেশে সুষম বাজেট কাম্য। আর তা নিশ্চিত করতে হলে সরকারি রাজস্ব প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে। সরকারি আয়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা যাক-

ক) ভর্তূকী ও বিশেষ বরাদ্দ : বর্তমানে সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ভর্তূকী প্রদান করে থাকে। কখনো কখনো বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশগুলোর জন্য এ ভর্তূকী ও বরাদ্দ অত্যন্ত জরুরি। এটি সম্ভব কেবলমাত্র সরকারি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে।

খ) ক্ষতিকর দ্রব্যের উৎপাদন নিরুৎসাহিতকরণ : সরকার বিভিন্ন ক্ষতিকারক পণ্য যেমন সিগারেট, অপিয়াম, এলকোহল ইত্যাদি তৈরীর ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার কর আরোপ করে। এর ফলে একদিকে সরকার অধিক হারে রাজস্ব আদায় করে অন্যদিকে ক্ষতিকারক পণ্য উৎপাদনও রোধ করে।

গ) শিশু শিল্প সংরক্ষণ : সরকার দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং উঠতি বিভিন্ন শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমদানী শুল্ক আরোপ করে থাকে। এতে একদিকে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় অন্য দিকে শিশু শিল্প বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

ঘ) পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : সরকার বিভিন্ন উৎস হতে যে আয় করে তার মধ্যে কতগুলো উৎস আছে যেগুলো থেকে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে। নিশ্চিত প্রাপ্তব্য রাজস্ব থাকলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে করা যায়। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পিত হয়।

ঙ) অর্থনৈতিক অসমতা হ্রাস : পুঁজিবাদী দেশে এবং মিশ্র অর্থনীতির দেশের অনেক ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব আদায়ের ফলে অর্থনৈতিক অসমতা তথা আয়ের বৈষম্য হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে সরকার ধনী শ্রেনীর উপর অধিক হারে কর আরোপ করে সমাজের গরীব জনগনের জন্য ব্যয় করতে পারে। যেমন-গরীবদেরকে রাজস্ব খাদ্য সরবরাহ, কম টাকায় বাসস্থান, ফ্রি মেডিকেল সহায়তা ইত্যাদি প্রদান।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীবৃন্দ সরকারি আয়ের সংজ্ঞা শেখার পাশাপাশি কোন কোন উৎস হতে সেই আয় অর্জিত হবে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবেন। বিশেষ করে কর হতে কিভাবে রাজস্ব আদায় করা হয় এবং কর বহির্ভূত উৎসগুলো কি কি তা জানবেন।

সারসংক্ষেপ

- সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব বিভিন্ন উৎস হতে পেয়ে থাকে। সরকারের অর্জিত রাজস্বই সরকারি আয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সরকারি আয়ের উৎস কত প্রকার?
ক) ২ খ) ৪ গ) ৩ ঘ) ৫

২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর হতে সরকারের আয় ছিল–
ক) ২০০৪০২ কোটি টাকা খ) ২২০৪০২ কোটি টাকা গ) ২১০৪০২ কোটি টাকা ঘ) ২৪০৪০২ কোটি টাকা

৩। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের আয় ছিল–
ক) ৩২৩৫০ কোটি টাকা খ) ২০৩৫০ কোটি টাকা গ) ২৮৩৫০ কোটি টাকা ঘ) ২২৩৫০ কোটি টাকা

৪। Value Added Tax কি?
ক) আবগারী শুল্ক খ) মূল্য সংযোজন কর গ) সম্পূরক শুল্ক ঘ) মুনাফা কর

৫। শিশু শিল্প কি?
ক) বৃহৎ শিল্প খ) ক্ষুদ্র শিল্প গ) মাঝারি শিল্প ঘ) উঠতি শিল্প

৬। পুঁজিবাদী দেশ কি?
ক) সমাজতান্ত্রিক দেশ খ) একনায়কতান্ত্রিক দেশ গ) ধনতান্ত্রিক দেশ ঘ) রাজতান্ত্রিক দেশ।

পাঠ ৯.৪ কর ব্যবস্থা
Taxation System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- করের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার করের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন;
- কর ও করের শ্রেনীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- করের কানুনসমূহ জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

কর

কর হলো জনসাধারণের বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ। জনগণ সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে। সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আয় যে উৎস হতে আসে তা হলো কর, একটি দেশের নাগরিকগণ তাদের আয়ের একটি অংশ কর হিসেবে সরকারকে প্রদান করে। তাই কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রত্যাশা ব্যতিরেকে একটি দেশের জনগণ সরকারি ব্যয় নির্বাহের স্বার্থে সরকারকে বাধ্যতামূলক ভাবে যে অর্থ প্রদান করে তাই কর।

করের উদ্দেশ্য :

একটি অর্থনীতিকে পরিচালনার জন্য সরকার প্রধানত কর থেকে বিভিন্ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে। এসব ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি খাত। স্বাভাবিকভাবে জনগণ সরকারকে কর প্রদান করে কোনরূপ প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রত্যাশা না করে। তবে পরোক্ষভাবে জনগণ বহু সুবিধা ভোগ করে থাকে। সঠিক ভাবে কর আদায় করে জনগনের কল্যানে ব্যয় করাই একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

করের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাজস্ব সংগ্রহ : রাজস্ব সংগ্রহ করাই কর ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সরকার প্রতিবছর বাজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে কি পরিমান রাজস্ব কোন কোন খাত হতে সংগৃহীত হবে। দেশের অভ্যন্তরীন শান্তিশৃংখলা রক্ষা, বিভিন্ন জনকল্যানমূলক কাজে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনীয় অর্থের সিংহভাগ আসে কর হতে।

২. কাম্য উৎপাদন বজায় রাখা : একটি দেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী যাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয় সে দিকে খেয়াল রাখে সরকার। যদি বিদেশী কোন পণ্য সস্তায় দেশের অভ্যন্তরে সহজলভ্য হয় তবে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই দেশীয় শিল্পকে রক্ষার জন্য প্রতিযোগী দ্রব্যের আমদানীর উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করা হয়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায় এবং দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এভাবে উৎপাদন কাম্য স্তরে রাখা যায়।

৩. ক্ষতিকারক দ্রব্যের ভোগ নিয়ন্ত্রন : সরকার বিভিন্ন ক্ষতিকারক দ্রব্য যেমন-মদ, আফিম, বিয়ার ইত্যাদির উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করে এগুলোর ব্যবহার নিরুৎসাহিত তথা নিয়ন্ত্রন করে থাকে।

৪. আয়ের সুষম বণ্টন : কর হচ্ছে সরকারের রাজস্বনীতির অন্যতম হাতিয়ার। এর মাধ্যমে দেশে বিরাজমান আয় বৈষম্য দূরীকরণ করা সম্ভব। ধনীদের উপর উচ্চ হারে কর আরোপ করে এই বৈষম্য দূর করা যায়।

৫. দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা : অর্থনীতিতে বানিজ্যচক্রের ফলে অনেক সময় মন্দা দেখা দেয়। তখন পণ্যের মূল্য পরিবর্তিত হলে সরকার প্রয়োজনে ভর্তূকী প্রদান ও কর আরোপ করে দ্রব্যের দাম পুনরায় ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনতে পারে।

৬. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। সরকার সঠিক কর নীতি তথা রাজস্বনীতি প্রয়োগ করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে পারে যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

কাজেই করের উদ্দেশ্য মূলত দেশের জনগনের কল্যানের জন্য। জনগনের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর আরোপ করে থাকে।

করের শ্রেণীবিভাগ

কর বোঝার উপর ভিত্তি করে করকে দুইভাগে ভাগ করা হয়:

১. প্রত্যক্ষ কর
২. পরোক্ষ কর

প্রত্যক্ষ কর

কোন ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে যদি সেই ব্যক্তিকেই করের আর্থিক ভার বহন করতে হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। অর্থাৎ যে করের ক্ষেত্রে করের প্রাথমিক ভার ও চূড়ান্ত ভার একই ব্যক্তির উপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। আরো সংক্ষেপে বললে, যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর আরোপিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন- আয়কর, মৃত্যুই কর, ভূমির রাজস্ব ইত্যাদি। এসকল ক্ষেত্রে যার উপর করা আরোপিত হয় তাকেই কর পরিশোধ করতে হয়। সে কোনভাবেই অন্যের উপর তার করের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না। এ জন্য এ করকে প্রত্যক্ষ কর বা Direct Tax বলা হয়।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা

প্রত্যক্ষ কর সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয়। এ করের সুবিধা সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. ন্যায়ভিত্তিক : প্রত্যক্ষ কর সততা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নাগরিকগণের আয়ের পরিমান এবং কর প্রদান সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয়। ফলে করভার বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অনুসরণ করা হয়।

২. নিশ্চয়তা : প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা কর প্রদানের পূর্বেই জানতে পারে যে কখন এবং কি পরিমান কর তাকে পরিশোধ করতে হবে। আবার সরকারও পূর্বেই জানতে পারে কোন উৎস হতে কি পরিমাণ রাজস্ব পেতে পারে। তাই প্রত্যক্ষ করের করদাতা ও কর গ্রহীতা কর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে বলে প্রত্যক্ষ কর নিশ্চয়তার নীতি মেনে চলে।

৩. মিতব্যয়িতা : প্রত্যক্ষ কর আদায় করতে সরকারের খরচ কম হয়। কারণ সরকার করদাতার কাছ থেকে সরাসরি কর আদায় করে। যেমন-আয়কর, কাজেই প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা লক্ষ্য করা যায়।

৪. স্থিতিস্থাপক : প্রত্যক্ষ কর স্থিতিস্থাপক। কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী করের পরিমান হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৫. উৎপাদনশীল : প্রত্যক্ষ করের হার পরিবর্তন করে এবং ধনী ব্যক্তির উপর অধিক হারে কর ধার্য করে অধিক রাজস্ব আদায় করা যায়। বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ কর উৎপাদনশীল।

৬. নাগরিক চেতনা : প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে একজন নাগরিক নিজে কর প্রদান করে। এতে সে বুঝতে পারে যে, দেশের উন্নয়নে সরকার যে ব্যয় করে তাতে তার অংশগ্রহণ আছে। তাই বলা যায়, প্রত্যক্ষ কর নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা

১. অপ্রিয় : প্রত্যক্ষ কর সরাসরি করদাতার পকেট থেকে দিতে হয়। তাই এটি অপ্রিয়। কেউ তার পকেট থেকে সুবিধা প্রত্যাশা ছাড়া অর্থ ব্যয় করতে চায় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়।

২. কর ফাঁকি : একজন করদাতা ইচ্ছা করে ভুল তথ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দিতে পারে। এতে কর ব্যবস্থাপনায় দূর্নীতির প্রসার ঘটতে পারে। তাই ব্যক্তির সততা না থাকলে প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেয়া সহজ।

৩. **স্বেচ্ছাচারিতা :** প্রত্যক্ষ করা বিভিন্ন লোকের উপর বিভিন্ন হারে বসানো হয়। এই হার নির্ধারনের কোন বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি নাই। করের হার ব্যক্তির সামার্থ্যের সাথে সামাজ্ঞস্যপূর্ণ করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক সময় ন্যায়নীতি উপেক্ষা করে করা নির্ধারন করা হয়।

৪. **সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস :** করের হার বেশী হলে প্রত্যক্ষ করদাতাদের কর্মোদ্যম হ্রাস পায়। এতে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস পায়।

পরোক্ষ কর

যে করের করযাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ে তাকে পরোক্ষ কর বলে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হলে, ব্যক্তি করের ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেমন-বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এরূপ করের করদাতা করের প্রকৃত বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেমন-বিক্রয় কর বিক্রেতার উপর আরোপ করা হলেও বিক্রেতা পণ্যের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে তা ক্রেতার উপর ফেলে। তাই বলা যায়, যে করে করযাত করদাতা নিজে বহন করে এবং করের প্রকৃত ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে তাই পরোক্ষ কর।

পরোক্ষ করের সুবিধা :

১. **পরোক্ষ কর জনপ্রিয়:** পরোক্ষ কর করদাতাকে সরাসরি জমা দিতে হয় না। কারণ এক্ষেত্রে তার উপর প্রত্যক্ষ কোন চাপ থাকে না। তাই এ কর জনপ্রিয়।

২. **সুবিধাজনক:** পরোক্ষ কর করদাতা এবং সরকার উভয়ের জন্য সুবিধাজনক। এক্ষেত্রে করের পরিমাণ দ্রব্যের দামের মধ্যেই থাকে। তাই এই কর প্রদান করা সুবিধাজনক। যেমন-একজন সিগারেট কিনলে প্রত্যেক সিগারেটের দামের মধ্যেই পরোক্ষ কর (VAT) থাকে।

৩. **কর ফাঁকি অসম্ভব:** পরোক্ষ কর দ্রব্যের দামের মধ্যে নিহিত থাকে বলে একজন ক্রেতা ঐ দ্রব্য কিনলেই কর দিতে হয়। কাজেই দ্রব্য ক্রয় করলে কর বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়ায়।

৪. **গরীব লোকদের অবদানের সুযোগ:** গরীবদের উপর সরকার প্রত্যক্ষ কর আরোপ করে না। কিন্তু যদি কোন দ্রব্য যে ক্রয় করে তবে সে দ্রব্যের দামের ভিতরে অন্তর্ভূক্ত করের টাকা ঠিকই প্রদান করে। কাজেই দেশের উন্নয়নে গরীব লোকদের অংশ গ্রহণের সুযোগ একমাত্র পরোক্ষ করের মাধ্যমেই রয়েছে। প্রত্যক্ষ করে নাই।

৫. **বিস্তৃত কর কাঠামো:** পরোক্ষ কর দেশের সকল নাগরিকের কাছ থেকে নেয়া হয়। ধনী গরীব নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিক দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারকে কর প্রদান করে। একমাত্র পরোক্ষ করের মাধ্যমেই নাগরিকদের কর প্রদানে বাধ্য করা সম্ভব হয়। তাই পরোক্ষ কর কাঠামো বিস্তৃত হয়।

৬. **স্থিতিস্থাপক:** পরোক্ষ কর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উপর আরোপ করা হয় যেগুলোর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। তাই সরকারের প্রয়োজনে এ করের হার ইচ্ছামত পরিবর্তন করে সরকার অর্থ সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারে। তাই পরোক্ষ কর স্থিতিস্থাপক।

৭. **সহজে আদায়যোগ্য :** পরোক্ষ কর সহজেই আদায় করা হয়ে থাকে। এই কর আদায়ে সরকারের খরচ কম হয়।

৮. **কর হারের সমতা :** পরোক্ষ কর সকলের সমান ভাবে দিতে হয়। যেমন- একটি দ্রব্য একজন ধনী বা গরীব উভয়েই ক্রয় করতে পারে। এতে করের পরিমান একই থাকে। তাই পরোক্ষ কর সমতার প্রতীক।

৯. **সামাজিক কল্যাণ :** পরোক্ষ কর সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। ক্ষতির দ্রব্য যেমন-মদ, সিগারেট ইত্যাদির উপর বেশী হারে পরোক্ষ কর আরোপ করলে এগুলোর দাম বাজারে বেড়ে যাবে। ফলে বেশী দামে অনেকেই কিনতে পারবে না। এতে সামাজিক কল্যাণ বাড়বে।

পরোক্ষ করের অসুবিধা:

১. **অসমতা :** পরোক্ষ কর যেহেতু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উপরই বেশী আরোপ হয়। তাই গরীব লোকদের উপরই এই করের চাপ বেশী পড়ে। কারণ এক্ষেত্রে করের ভিত্তির উপর নির্ভর করে কর নির্ধারিত হয় না।

২. **অনিশ্চিত :** সরকার পরোক্ষ করের সমুদয় অর্থ পাবে কিনা এ ব্যাপারে অনিশ্চিত থাকে। কারণ করা আরোপিত পণ্যগুলো সব বিক্রি নাও হতে পারে। তাই এই খাত হতে রাজস্বের পরিমাণ কত হবে তা পূর্বে জানা যায় না।

৩. পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে : পরোক্ষ কর আরোপের ফলে পণ্যের মূল্য অযাচিতভাবে বেড়ে যায়। দামের মধ্যে নিহিত থাকে বলে পরোক্ষ কর আরোপ অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক হয় না। এর কোন মাপকাঠি নাই। পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে দেশের ব্যবসা-বানিজ্য এবং লেনদেনে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৪. নাগরিক চেতনা হ্রাস করে : পরোক্ষ কর প্রদান করলে করদাতা কোন রকম প্রত্যক্ষ চাপের সম্মুখীন হয় না। অনেকে বোঝেই না যে সে কর প্রদান করছে। আর করের টাকা সরকার কোন খাতে ব্যয় করে থাকে তাও করদাতা জানেনা। তাই এ কর নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি না করে বরং হ্রাস করে।

৫. শিল্পায়নের জন্য ক্ষতিকর : যদি শিল্পের কাঁচামালের উপর পরোক্ষ কর বসানো হয় তবে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। কারণ কাঁচামালের উপর কর আরোপ করলে দাম বেড়ে যাবে। ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে।

করের কানুন

অর্থনীতির জনক এডাম স্মীথ সর্বপ্রথম তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The wealth of Nations"-এ করের কানুনের কথা উল্লেখ করেন। একটি উত্তম কর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট কি হওয়া উচিত তার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি করের কানুনের কথা বলেছেন। তিনি করের চারটি কানুনের কথা বলেছিলেন।

১. সমতার কানুন
২. নিশ্চয়তার কানুন
৩. সুবিধার কানুন
৪. মিতব্যয়ীতার কানুন

কর ধার্য বা আদায় করার জন্য সরকার কতগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলে। এই নিয়মগুলোই করের কানুন।
উপরের চারটি ব্যতীত আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আরও কয়েকটি কানুনের উল্লেখ করেছেন-

৫. উৎপাদন শীলতার কানুন
৬. স্থিতিস্থাপকতার কানুন
৭. সরলতার কানুন
৮. বিভিন্নতার কানুন

নিচে করের কানুনসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. **সমতার কানুন:** সমতা বলতে এখানে সকল নাগরিকের সমান কর প্রদান বুঝায় না, নাগরিকগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বেশী কর প্রদান করবে আর গরীবরা কম প্রদান করবে। এটি সামাজিক সাম্যতা আনার একটি মৌলিক বিষয়।

২. **নিশ্চয়তার কানুন:** নিশ্চয়তার কানুন বলতে বুঝায় যে, একজন করদাতা তার কর প্রদান সম্পর্কে অর্থাৎ করের পরিমান, প্রদানের সময় ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকে। যদি নিশ্চয়তার কানুন না থাকে তবে কর আইন প্রণয়ন করা কঠিন হবে এবং কর ফাঁসি প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. **সুবিধার কানুন:** সুবিধার কানুন হলো করদাতা সহজেই তার কর প্রদান করতে পারে। কর প্রদানে কোন অফিসিয়াল জটিলতা থাকে না। কর দাতা তার সুবিধা অনুযায়ী করের টাকা প্রদান করে। যেমন-চাষীর নিকট থেকে ফসল উঠার পর এবং ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে বছর শেষে কর আদায় করার উচিত।

৪. **মিতব্যয়ীতার কানুন:** কর সংগ্রহ করার খরচ কম হওয়া উচিত। এটিই মিতব্যয়ীতার কানুন। করের টাকা দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য খরচ করা হয়। যদি এই অর্থ আদায়ের খরচ বেশী হয় তবে প্রত্যাশিত রাজস্ব কম হবে এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রত্যাশিত হবে না।

৫. **স্থিতিস্থাপকতার কানুন:** করের ভিত্তির উপর নির্ভর করে কর হার বাড়ানো বা কমানো হলো স্থিতিস্থাপতার কানুন। অর্থাৎ দেশের রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী করের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে প্রত্যাশিত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। যেমন-আয় কর একটি প্রত্যক্ষ কর। এটি স্থিতিস্থাপকতার কানুন মেনে চলে।

৬. **সরলতার কানুন:** কর ব্যবস্থা যতটা সম্ভব সহজ হওয়া উচিত। করের টাকার পরিমান, প্রদানের সময়, প্রদানের পদ্ধতি সবকিছু করদাতার কাছে সহজ ও সরল হওয়া উচিত। কোন প্রকার জটিলতা থাকা উচিত নয়। যদি কর প্রদান ব্যবস্থা সহজ হয় তবে কর আদায়ে দূর্নীতি এবং কর ফাঁকি হ্রাস পাবে।

৭. **বিভিন্নতার কানুন:** কর আদায় করার ক্ষেত্রে কোন একক উৎস থাকা উচিত নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে কর আদায় করা উচিত। অন্যথায় অর্থনীতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও কম হবে। বিভিন্নতার কানুন অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন উৎস হতে বিভিন্ন কর হারের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারে।

সুতরাং একটি দেশের কর ব্যবস্থায় করের সকল কানুন অবলম্বন করে কর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে ঐ দেশের অর্থনীতি কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীবৃন্দ কর ও করের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়বেন এবং লিখবেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জানবেন।

সারসংক্ষেপ

- একটি দেশের জনগণ কোন রূপে প্রত্যক্ষ সুবিধা ব্যতিরেকে সরকারকে কর প্রদান করে থাকে। কর প্রদানের মাধ্যমে জনগণ সরকারি ব্যয়ের সাথে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন উৎস হতে সরকার কর আদায় করে থাকে যেমন- আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কর কি?
- ক) জনগণ কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধার বিপরীতে প্রদেয় অর্থ
- ক) জনগণ কর্তৃক বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ
- গ) ফি এর ন্যায় প্রদেয় অর্থ
- ঘ) ইচ্ছাকৃত প্রদত্ত অর্থ

২। করের বোঝার উপর ভিত্তি করে কর কত প্রকার?
- ক) ৩
- খ) ৪
- গ) ২
- ঘ) ৫

৩। কোনটি প্রত্যক্ষ কর?
- ক) VAT
- খ) বিক্রয় কর
- গ) আয়কর
- ঘ) কোনটিই নয়।

৪। মূল্য সংযোজন কর কেমন কর?
- ক) বিক্রয় কর
- খ) পরোক্ষ কর
- গ) প্রত্যক্ষ কর
- ঘ) ক্রয় কর।

পাঠ ৯.৫ বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণ
Budget Deficit and Public Debt

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাজেটের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ জানতে পারবেন;
- বাজেটের গুরুত্ব জানতে পারবেন;
- সরকারি ঋনের উৎস সমূহ জানতে পারবেন;
- সরকারি ঋনের উদ্দেশ্য সমূহ জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাজেট শব্দটি Bougette শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই ফরাসী শব্দটির অর্থ হলো ব্যাগ বা থলে। বৃটিশ অর্থমন্ত্রী ১৭৩৩ সালে কমন্স সভায় সর্ব প্রথম বাজেট শব্দটির উল্লেখ করেন। তখন থেকে বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
সাধারনত কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই বাজেট। একটু বাড়িয়ে বললে বাজেট হলো একটি নির্দিষ্ট বৎসরে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব যেখানে ঐ সময়ের আর্থিক অবস্থা ও আর্থিক উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর্থিক পরিকল্পনাকেই বাজেট বলে। মূলত: ব্যক্তি বা সরকারের আয়ের সীমাবদ্ধতা থাকার জন্যই বাজেট করতে হয়। ব্যক্তি তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করে, অপরদিকে সরকার এরূপ আচরন নাও করতে পারে। সরকার তার ব্যয় অনুযায়ী আয় সংগ্রহ করতে পারে। তবে ব্যক্তি ও সরকার উভয়েরই আয়-ব্যয়ের প্রতিচ্ছবি হলো বাজেট।

ব্যক্তিগত বাজেট বনাম সরকারি বাজেট

ব্যক্তি তার মৌলিক চাহিদা যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করে থাকে। এক্ষেত্রে সে সাপ্তাহিক বা মাসিক বাজেট তৈরী করে। কারণ ব্যক্তি তার আয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে পেয়ে থাকেন। ইংরেজিতে একটি কথা আছে "Cut your coat according to your cloth" এই বিষয়টি মাথায় রেখে সাধারণত কোন ব্যক্তি তার বাজেট করে থাকে। অর্থাৎ সে তার অর্জিত আয়ের সাথে ব্যয়ের যে সমন্বয় করবে তা তার বাজেট দ্বারা ঠিক করবে।
সরকার ব্যক্তির চেয়ে বৃহৎ ধারণা। কাজেই সরকারি বাজেটেও একটি বৃহৎ ধারণা। তবে ব্যক্তির বাজেটের সাথে সরকারের বাজেটের বেশ কিছু মিল-অমিল আছে। সরকার সাধারণত বাৎসারিক বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। আবার ৩ বৎসব বা ৫ বৎসর মেয়াদি বাজেটও থাকতে পারে। তবে ব্যক্তি যেমন তার আয় অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারণ করে। সরকার তার ঠিক উল্টো কাজটি করে। সরকার আগে ব্যয় নির্ধারণ করে তার পর ব্যয় অনুযায়ী বাজেটে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত গুলোকে গুরুত্ব দেয়। অর্থনীতির বড় বড় বিষয় যেমন-নিয়োগ, বিনিয়োগ, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, সম্পদের কাম্য ব্যবহার, উৎপাদন ইত্যাদি সরকারি বাজেটে স্থান পায়। তাই সরকারি বাজেটকে একটি উচুঁ স্তরের আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

বাজেট-রেখা

ব্যক্তি বা সরকার বাজেট করার ক্ষেত্রে যে সমীকরণ ব্যবহার করে তাকে বাজেট সমীকরণ বলে। বাজেট সমীকরণে প্রকাশ পায় বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত আয় কিভাবে বণ্টিত হয়। উদাহরণ- সরূপ বলা যায়-
যদি X দ্রব্যের দাম Px এবং Y দ্রব্যের দাম Py এবং ভোক্তার আয় M হয়, তবে বাজেট সমীকরণটি হবে।

$P_x, X + P_y. Y = M$

একটি সংখ্যা সূচক সমীকরণ বিবেচনা করা যাক, ধরা যাক, X দ্রব্যের একক প্রতি দাম ৫ টাকা এবং Y দ্রব্যের একক প্রতি দাম 10 টাকা এবং আয় 100 টাকা। এক্ষেত্রে বাজেট সমীকরণটি হবে।

$$5x+10y=100$$
$$or,\ 10y=100-5x$$
$$\therefore\ y=\frac{100-5x}{10}$$

এখন X এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে Y এর প্রাপ্ত মানগুলো নিম্নরূপঃ

X	0	10	20
Y	10	5	0

এখন উপরোক্ত টেবিল থেকে নিম্নে একটি রেখা আংকন করা হলো।

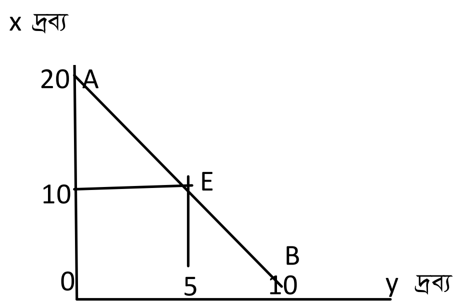

উপরের চিত্রে অংকিত AB রেখাটিই বাজেট রেখা

এই বাজেট রেখার প্রত্যেক বিন্দু যেমন : A, E ও B বিন্দুতে ভোক্তার মোট ব্যয় 100 টাকা । এই 100 টাকা সে x ও y দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে। যেমন : E বিন্দুতে 10একক x এবং 5 একক y ক্রয় করে থাকে।

বাজেটের গুরুত্ব

আধুনিক অর্থনীতিতে বাজেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি দেশের বাজেট প্রকাশিত হলে ঐ দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাজেটে সরকারি আয়ের পরিমাণ ও উৎসগুলো স্পষ্ট থাকে। সরকার কোন কোন খাতের কি পরিমান অর্থ ব্যয় করবে তার একটি চিত্র থাকে। ফলে দেশের জনগণ সহজেই বুঝতে পারে সরকার তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিভাবে করছে। অর্থনীতির দুটি প্রধান সমস্যা হলো বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি। এই দুটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বাজেটের ভূমিকা অপরিসীম। বাজেটের মাধ্যমে সরকারের ব্যয় তথা বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমান প্রকাশিত হয়। আর বিনিয়োগ বাড়লে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। আবার বাজেটের মাধ্যমে সরকার সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রন কিভাবে থাকবে যেমন, কোন ক্ষেত্রে কর, কোন ক্ষেত্রে ভর্তূকী হ্রাস-বৃদ্ধি হবে তা প্রকাশ করে থাকে। ফলে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত নিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আবার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রন তথা স্থিতিশীল রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রন করা হয় এই বাজেটের মাধ্যমেই। বাজেটের মাধ্যমে সরকারি পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়, অর্থনৈতিক অর্জন গুলো কি তা জানা যায় এবং নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়। মূলতঃ বাজেটের মাধ্যমে একটি দেশের আয়-ব্যয়-সঞ্চয়-বিনিয়োগ সম্পর্ক বর্ণনা করা যায় এবং সরকারি অর্থনৈতিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বাজেটের মাধ্যমে বাজেটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলোঃ

রাজস্ব বাজেট :

রাজস্ব বাজেট সাধারণত রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। সরকারের দৈনন্দিন ব্যয় পরিচালনার জন্য এ বাজেট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারের প্রশাসন, সামাজিক সেবা সমূহ, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি হলো প্রধান ব্যয়ের খাত। অপরদিকে সরকারি কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব হলো রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। রাজস্ব বাজেট মূল্য একটি অনুৎপাদনশীল বাজেট। কারণ এটি কেবল সরকারের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনার জন্যই করা হয়। এ বাজেটের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোন আয় উপার্জনের সুযোগ নেই। রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সাধারণত ব্যবধান থাকে। কারণ সরকার সব সময় আয় থেকে ব্যয় বেশী করে। এই ব্যবধানকে বলা হয় রাজস্ব ঘাটতি।

উন্নয়ন বাজেট

দেশের উন্নয়ন মূলক কাজ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বাজেট হয় তাকে উন্নয়ন বাজেট বলে। দেশের অবকাঠামো যেমন- রাস্তা ঘাটে, ব্রীজ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি খাতে সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাবই হচ্ছে উন্নয়ন বাজেট। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সম্প্রসারণ, শিক্ষা হার বৃদ্ধি, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মান, শিক্ষকদের ভাতা প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। একই ভাবে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন যেমন- বিভিন্ন হাসপাতালের উন্নয়ন, ঔষধ ও প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে সরকার প্রতিনিয়ত উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে। অর্থাৎ জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সরকার বাজেট প্রনয়ন করে থাকে।
আয় ব্যয়ের সমতার দৃষ্টিকোন থেকে বাজেট তিন প্রকার–

সুষম বাজেট

সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকলে অর্থাৎ আয় এবং ব্যয় যদি সমান হয় তবে তাকে সুষম বাজেট বলা হয়। সুষম বাজেট নীতি প্রণয়ন করলে দেশে মুদ্রস্ফীতির সম্ভাবনা কম থাকে। এ বাজেটের মাধ্যমে সরকারের পক্ষে মিতব্যয়ী হওয়া সম্ভব হয়। এটি আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করে না বরং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে জনসাধারনের আস্থা বৃদ্ধি করে।

ঘাটতি বাজেট

বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে সুষম বাজেটের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। জনগনের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হলে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হলে ঘাটতি বাজেট করতে হয়। অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশ এমনকি উন্নত দেশ সমূহও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেট করে থাকে। এ বাজেটের মাধ্যমে দেশের রাজস্বনীতির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়। বানিজ্য চক্রের উত্থান পতনের সাথে সাথে এ বাজেট প্রণয়ন করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা যায়। এছাড়া মূলধন গঠনের জন্য এ বাজেটের কোন বিকল্প নাই। ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্ব পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এক্ষেত্রে দেশের অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি দেশের ঘাটতি বাজেট কর উচিত।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা প্রত্যেক সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আর এটা নিশ্চিত করতে হলে কর নীতি ও ব্যয় নীতি সঠিক ও যুগোপযোগী ভাবে প্রণয়ন করতে হবে। আর, বানিজ্য চক্রের প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের আর্থিক নীতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বাজেট ভূমিকা রাখে। সুতরাং, বাজেট শুধু সরকারের আয়-ব্যয়ের দলিলই নয়, এটি সরকারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উদ্বৃত্ত বাজেট

ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। সাধারণত সরকারের বাজেট এমন হয় না।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট:

অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট ২০১৬-১৭
সম্পদের ব্যবহার

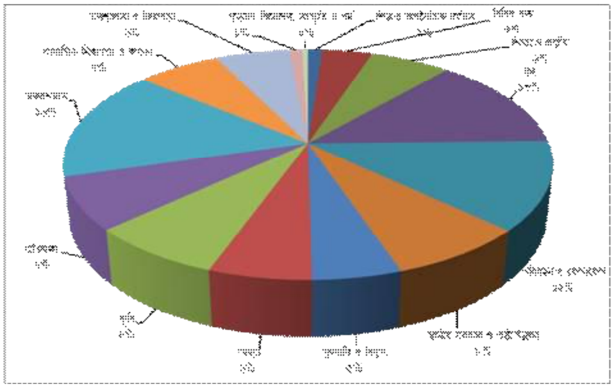

বাজেটের উৎস ২০১৬-১৭

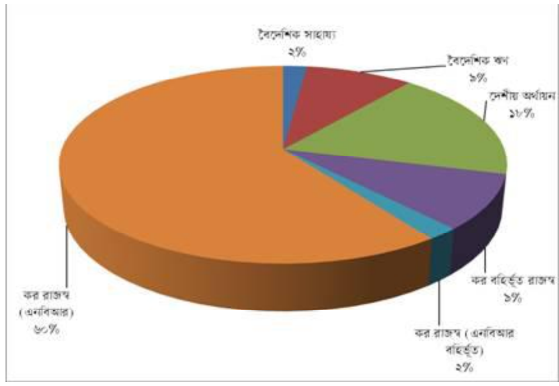

২০১৬-১৭ সালের জাতীয় বাজেটের বৈশিষ্ট্য

দেশের অর্থনীতিতে বাজেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানকালে বাজেট কেবল সরকারের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাবই নয়; বরং এটা হচেছ সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত একটি মাষ্টার প্ল্যান। প্রথাগত দিক থেকে যদিও বাজেটে সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব একটি বিশেষ অর্থ বছরে সীমাবদ্ধ থাকে তবুও প্রতিটি বাজেটেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতীতের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং আগামী দিনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়। বর্তমানকালে জাতীয় বাজেট সরকারের রাজনৈতিক দর্শন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটের কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

২০১৬ - ১৭ অর্থ বছরের বাজেটের আকার

সীমিত সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। এ বাজেটের আকার হচ্ছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬ শত ৫ কোটি টাকা। প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে স্লোগান ধরণ করে বিশাল আকারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এ বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ২,৪২,৭৫৩ কোটি টাকা এবং বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৯৭,৮৫৩ কোটি টাকা। উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৭ টাকা; তন্মোধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ধার্য্য করা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯ শত ৬৬ টাকা।

(ক) ২০১৬-১৭ বাজেটের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২,৪২,৭৫২ কোটি টাকা যা জিডিপির ১২.৪ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আসবে ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। মোট বাজেটের ৭১.৩ শতাংশ অর্থই আসবে জনগণ থেকে এবং বাদ বাকী আসবে ঋণ থেকে।

খাতভিত্তিক রাজস্ব আয়ের উৎস: ২০১৬-১৭ অর্থ বছর (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ	মোট রাজস্বের শতকরা
০১।	আয়কর ও মুনাফা	৭১৯৪০	২৯.৬৩
০২।	মূল্য সংযোজন কর	৭২৭৬৪	২৯.৯৭
০৩।	সম্পূরক শুল্ক	৩০,০৭৫	১২.৩৯
০৪।	আমদানী শুল্ক	২২৪৫০	৯.২৬
০৫	এনবিআরের অন্যান্য আদায়	৫৯২৩	২.৪৪
০৬	এনবিআরের বাহিরের কর	৭২৫০	২.৯৮
০৭	কর ব্যতীত রাজস্ব	৩২৩৫০	১৩.৩৩
	সর্বমোট আয় =	২,৪২,৭৫২	১০০

*এন বি আর- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২০১৬-১৭ বাজেটে ভ্যাটের (VAT) আওতা অনেক সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ভ্যাট যেহেতু একটি পরোক্ষ কর কাজেই সাধারণ জনগণকেই এ কর ভার বহন করতে হয়। বাজেটে ভ্যাটের অংশ ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ৭২,৭৬৪ কোটি টাকা।

সরকারি ব্যয়: ২০১৬-১৭ বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,৪০,৬০৫ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৩৮,৫৮৭ কোটি টাকা বেশী। সরকারী কর্মচারীদের নানা রকম ভাতা বৃদ্ধির ফলে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঘ) বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন

বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৯৭ হাজার ৮ শত ৫৩ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে ৩৬ হাজার ৩ শত ৫ কোটি টাকা (৩৭.১০ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬১ হাজার ৫ শত ৪৮ কোটি টাকা (৬২.৯০ শতাংশ) সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৩৮,৯৩৮ কোটি টাকা যা প্রায় ৪০ শতাংশ।

২০১৬-১৭ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	খাত	পরিমান	শতকরা
০১।	সঞ্চয়পত্র	১৯৬১০	২০.০৪
০২।	অনুদান	৫৫১৬	৫.৬৩
০৩।	বৈদেশিক ঋণ	৩০৭৮৯	৩১.৪৬
০৪।	ব্যাংক ঋণ	৩৮৯৩৮	৩৯.৭৯
০৫।	অন্যান্য উৎস	৩০০০	৩.০৬
	সর্বমোট =	৯৭,৮৫৩	৩.০৬

ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সংকোচিত হয়। সঞ্চয়পত্র বিক্রি করার অর্থের পরিমাণ ১৯ হাজার ৬ শত ১০ কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্রের বিক্রির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ সরকারের উপর অতিরিক্ত সুদের বোঝা সৃষ্টি করে। কারণ সঞ্চয়পত্রের সুদের হার ব্যাংকের সুদের হার অপেক্ষা অনেক বেশী। সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেন্ড ফান্ডের জন্য অনেক বেশী হারে সুদ দেয়া হয়। এ খাত থেকেও সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক্রমিক	খাত	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	পার্থক্য/বাড়তি	শতকরা বৃদ্ধি
০১।	শিক্ষা	৩১,২০৪	৪৯,০০৯	১৭,৪০৭	৫৫.৭৮
০২।	খাদ্য	১৬৭১	২,৪৪২	৭৭১	৪৬.১৪
০৩।	সুদ পরিশোধ	৩৫,১০৯	৩৯,৯৫১	৪,৮৪২	১৩.৭৯
০৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৬,২৩৯	৩৪,৪৫২	৪,৮২৩	১৮.২৩
০৫।	স্থানীয় সরকার	১৮,৮৬৮	২১,৩২২	২,৪৫৪	১৩.০০
০৬।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৭,৪৪০	৮,০০৫	৫৬৫	৭.৫৯
০৭।	জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১৩,৬৩০	২১,৮৫২	৮২২২	৬০.৩২
০৮।	ভর্তুকি ও দায়	৬,৫০৯	৭,৫০৯	৯৭০	১৪.৯০
০৯।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১২,৬৯৫	১৭,৪৮৭	৪৭৯২	৩৭.৭৫
১০।	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	১৮,৫৪১	১৫,০৩৬	- ৩৫০৫	-১৮.৯০
১১।	কৃষি	১২,৬৯৯	১৩,৬৭৫	৯৭৬	৭.৬৮
১২।	পানি সম্পদ	৩,৮৮৬	৪৭১৩	৮২৭	২১.২৮
১৩।	প্রতিরক্ষা	১৮,৩৭৭	২২,১১৫	৩৭৩৮	২০.৩৪
১৪।	প্রযুক্তি	১,৫৫০	২,০৭০	৫২০	৩৩.৫৫

উৎস : বাজেট বক্তৃতা ২০১৬-২০১৭

উপরে লক্ষ্যণীয়, বাজেটে রাজস্ব ব্যয় সবচেয়ে বেশি বেড়েছে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে এবং তার পরে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষা খাতে। কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশী করতে হয়েছে। অতঃপর খাদ্য নিরাপত্তা খাতে ও স্বাস্থ্য খাতে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষিখাতে বরাদ্দ খুবই কম বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগ খাতে বৃদ্ধির হারও কম। সুদ খাতে বরাদ্দের হার অনেক বেশি, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে।

সরকারি ঋণ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার যখন ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে অর্থাৎ যখন রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয় তখন সরকারকে অবশ্যই ঋণ করতে হয়। এ ঋণ মূলত: সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য করতে হয় রাজস্ব ঘাটতি হলে সরকার বিভিন্ন বন্ড ও বিল বিক্রি করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সরকার তার ব্যয় নির্বাহের জন্য করের উপার চাপ সৃষ্টি না করে অনেক সময় ঋণ করে থাকে। সরকারের এসব ঋণকেই সরকারি ঋণ বলে।

সরকার কেন ঋণ গ্রহণ করে?

সরকার যে অর্থ ঋণ করে থাকে তা মূলত বাজেট ঘাটতির সমান হয়। সরকরা ঋন করে অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের অর্থায়নের জন্য। কারণ শুধু মাত্র কর থেকে অর্জিত রাজস্ব দ্বারা প্রত্যাশিত ব্যয় করা সম্ভব হয় না। সরকারি ঋণকে জাতীয় ঋণ বা সরকারি খাতের ঋণ বলা হয়।

১. **প্রত্যাশিত কর রাজস্ব না পাওয়া:** সরকার বাজেট প্রণয়নের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন করে। এই ব্যয় করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় করতে না পারলে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় সরকারি ব্যয় হ্রাস করতে হবে। সরকারি ব্যয় হ্রাস না করে উন্নয়নের গতি ঠিক রাখার জন্য সরকার ঋণ করে থাকে।

২. **অর্থনৈতিক মন্দা:** অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় সরকার ঋণ করে থাকে। বেকারত্ব লাঘব করার জন্য সরকারকে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু মন্দার সময় এই বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হয়। কারণ একদিকে উচ্চতর কর আর অন্যদিকে বেকারত্ব থাকলে অর্থনীতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেয়ে অর্থনীতির অবস্থা অবনতি হতে পারে।

৩. **অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ:** সরকার দেশের জনগনের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন-স্কুল-কলেজ নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মাণ, রাস্তা ঘাট, ব্রীজ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত হয়। ফার্ম যেমন বিনিয়োগের জন্য ঋণ গ্রহণ করে সরকার ও সেই আচরণ করে।

৪. **রাজনৈতিক কারণ:** দেশের ভোটাররা সব সময় চায় কম কর দিতে। আবার বেশী সরকারি ব্যয় প্রত্যাশা করে। এতে সরকার বাজেট প্রণয়নে সমস্যায় পড়ে এবং ঘাটতি বাজেট করতে বাধ্য হয়। কাজেই জনগনের উপর করের বোঝা না চাপিয়ে সরকার অনেক সময় রাজনৈতিক ভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ঋণের উপর নির্ভর করে।

৫. **যুদ্ধ:** যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা খাতে এবং দেশের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয় অপ্রত্যাশিত। তাই যুদ্ধের সময় সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

৬. **সস্তা ঋণ:** অর্থনীতির মন্দাবস্থায় ঋণের সুদের হার কম থাকে। ফলে সরকার কর না বাড়িয়ে ঋণ বাড়ায়।

সরকারি ঋণের উৎস

সরকারি ঋণের উৎস দুই প্রকার

১। অভ্যন্তরীন উৎস

২। বাহ্যিক উৎস

অভ্যন্তরীন উৎস: অভ্যন্তরিন উৎস হলো দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উৎস হতে যখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে। বিভিন্ন অভ্যন্তরিন উৎস রয়েছে যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি। অভ্যন্তরীন উৎস সমূহের হাতিয়ার গুলো হলো বাজার ঋণ, বন্ড, ট্রেজারি, বিল ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীন ঋণ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা যায়। এটি দেশে আয় ও সম্পদের এক ধরনের পুণ:বন্টন। তাই এর কোন প্রত্যক্ষ অর্থ বোঝা থাকে না। অভ্যন্তরীন উৎসে সরকার দেশীয় ঋণদাতাদের কাছে দেনা থাকে।

বাহ্যিক উৎস: সরকার যখন বিদেশ থেকে অথবা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে তখন সেটি বাহ্যিক উৎস। এই উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করলে তা বিদেশী মুদ্রার পরিশোধ করতে হয়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এই ঋণ সহায়ক হয়। এটি বিদেশ হতে স্বদেশে অর্থের স্থানান্তর। এক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। বাহ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে সরকার বিদেশী ঋণদাতাদের কাছে দেনা থাকে। সরকারি ঋণ আরও করগুলো দৃষ্টিকোন থেকে ভাগ করা হয়েছে।

১। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ
২। স্বেচ্ছা ঋণ ও বাধ্যতামূলক ঋণ
৩। উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ
৪। পরিত্রানযোগ্য ঋণ ও অপরিত্রানযোগ্য ঋণ

নিম্নে এসব ঋণের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. **স্বল্পকালীন ঋণ ও দীঘকালীন ঋণ:** স্বল্পকালীন ঋণ হলো এমন ঋণ যার মেয়াদ ৩ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত। সাধারণত এরূপ ঋণের সুদের হার কম থাকে। অপরদিকে দীর্ঘকালীন ঋণের মেয়াদ ১০ বৎসর বা তার চেয়ে বেশী। সাধারণত এরূপ ঋণের সুদের হার বেশী থাকে। দীর্ঘকালীন ঋণ মূলত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অথবা অন্যান্য দীর্ঘকালীন প্রকল্প বাস্তাবায়নের জন্য করা হয়ে থাকে।

২. **স্বেচ্ছা ঋণ ও বাধ্যতামূলক ঋণ:** সরকার যখন বিভিন্ন ঋণপত্রের মাধ্যমে জনগনকে ঋণপত্র কিনতে আকৃষ্ট করে তখন তাকে স্বেচ্ছা ঋণ বলে। কারণ জনগণ উচ্চ সুদের হার প্রাপ্তির আশায় সরকারকে ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে। বাধ্যতামূলক ঋণ বর্তমান বিশ্বে খুবই কম দেখা যায়। সাধারনত যুদ্ধকালীন সময়ে সরকার জনসাধারন থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে তা অনেকটা জনগন বাধ্য হয়ে দিয়ে থাকে। এ ঋণ অতি কম সুদের হারে দ্রুত সরকার পেয়ে থাকে। এ ঋণ অনেকটা করের সামিল।

৩. **উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ:** যখন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অথবা একটি দেশের উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলে। সরকার রেললাইন স্থাপন, সেচ ব্যবস্থা প্রকল্প, বিদ্যুৎ শক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি নিশ্চিত করার প্রয়াসে ঋণ করলে তাতে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। আর এ ঋণ কখনো বোঝা হয় না। অন্যদিকে সরকারি ঋণ যখন উৎপাদন বৃদ্ধি না করে বরং জনগনের উপর পরোক্ষ চাপের কারণ হয় তখন তাকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের সাহায্য, সামাজিক সেবা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋন অনুৎপাদনশীল হয়ে থাকে।

৪. **পরিত্রানযোগ্য ঋণ এবং অপরিত্রানযোগ্য ঋণ:** সরকার ঋণ গ্রহণ করে তা যদি ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে তাহলে তা পরিত্রানযোগ্য ঋণ হবে। আর ঋণ গ্রহণ করে যদি শুধুমাত্র সুদ প্রদান করতে থাকে কিন্তু ঋণের আসল প্রদান করার কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় না থাকে তবে তাকে অপরিত্রানযোগ্য ঋণ বলা হয়।

সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য

সরকারি ঋণের উদ্দেশ্য মূলত: সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের সংস্থান করা। তবে তিনটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকারি ঋণ গৃহীত হয়-

১। ঘাটতি বাজেট পূরণ করা
২। যুদ্ধ ও অন্যান্য অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা
৩। উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা

এসবের বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

১. **ঘাটতি বাজেট পূরণ করা:** বাজেট ঘাটতি থাকলে তা পূরণে সরকার ঋণ করে থাকে। তবে যদি প্রতি বৎসরই বাজেটে ঘাটতি থাকে তবে সরকারের ঋণের উপর নির্ভর না করে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করা উচিত।

২. **যুদ্ধ ও অন্যান্য অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করা:** পৃথিবীর অনেক দেশেই যুদ্ধকালীন সরকারি ঋণ বেশি দেখা গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনেক দেশেই উল্লেখযোগ্যভাবে সরকারি ঋণ বেড়ে গিয়েছিল। আবার অনেক সময় অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে। যেমন বর্তমানে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরর্নাথী রয়েছে। তারা মায়ানমার থেকে আগত। এখন তাদের খরচ চালানোর জন্য সরকার ঋণ করতে পারে।

৩. **উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা:** উন্নয়ন কর্মসূচী তথা প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার ঋণ করে থাকে। ব্রিটিশ আমলে সরকার রেল লাইন, সেচ প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ করেছিল। স্বাধীনতার পরে সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ঋণ করেছিল। দিন দিন এই ঋণ বাড়ছে।
সুতরাং দেখা যায় সরকার দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার ঋণ করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীবৃন্দ বাজেটের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ভালোভাবে আয়ত্ত করবেন এবং কিভাবে বাজেট করতে হয় তা শিখবেন। শিক্ষার্থীগণ সরকারি ঋণ, ঋণের উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত পড়াশুনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

- বাজেট হলো সরকারের একটি আর্থিক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব। এটি সরকারের আর্থিক উদ্দেশ্যসমূহকে প্রতিফলিত করে। বাজেটের মাধ্যমে সরকারি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে। তাই বাজেটের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাজেট শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ হতে হয়েছে?
ক) Badget খ) Backet গ) Bougette ঘ) Bogett

২। ১৭৩৩ সালে সর্বপ্রথম কে বাজেট শব্দটির উল্লেখ করেছেন?
ক) বৃটিশ অর্থমন্ত্রী খ) মার্কিন অর্থমন্ত্রী গ) ভারতের অর্থমন্ত্রী ঘ) জার্মানি অর্থমন্ত্রী

৩। ঘাটতি বাজেট কি?
ক) ব্যয় আয়ের চেয়ে কম হলে খ) আয়-ব্যয়ের সমান হলে
গ) ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি হলে ঘ) আয় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হলে

৪। সরকার কোন ঋণ করে?
ক) বিলাস করার জন্য খ) ঘাটতি অর্থসংস্থানের জন্য
গ) অনুন্নয়ন ব্যয়ের জন্য ঘ) প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য

৫। সরকারি ঋণের উৎস কত প্রকার?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। মিজান সাহেব মাসিক ১৮০০০ টাকা বেতনে চাকুরি করেন। তার চারটি ছেলে-মেয়ে। সংসার খরচ আয়ের চেয়ে বেশি। রবিবারে মিজান সাহেব ৫০০ টাকা নিয়ে বাজারে গেছেন। তার উদ্দেশ্য চাল ও মাছ কিনবেন। প্রতি কেজি চালের দাম ৫০ টাকা এবং প্রতি কেজি মাছের দাম ১০০ টাকা। তিনি সমস্যায় পড়েছেন কি পরিমাণ চাল ও মাছ কিনবেন।
ক) বাজেট কী?
খ) মিজান সাহেবের রবিবারের বাজেট সমীকরণ লিখুন।
গ) বাজেটের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
ঘ) মিজান সাহেব কিভাবে তার পরিবার পরিচালনা করবেন?

২। বাংলাদেশ সরকারের প্রায় প্রতিবছরই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়। এই বৎসর সরকার চিন্তা করছে কতগুলো খাতে ভর্তূকি বৃদ্ধি করবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করবে। কিন্তু সরকারের আয়ের উৎসসমূহ কম। ব্যয়ের খাত অনেক বেশি। বাধ্য হয়ে সরকার ঋণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ক. সরকারি ঋণ কি?

খ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো কি কি?

গ. সরকারি ঋণের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।

ঘ. সরকার কি ঘাটতি বাজেট করবে?

উত্তরমালা

পাঠ ৯.১:	১। গ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। গ		
পাঠ ৯.২:	১। গ	২। গ	৩। খ			
পাঠ ৯.৩:	১। ক	২। গ	৩। ক	৪। খ	৫। ঘ	৬। গ
পাঠ ৯.৪:	১। খ	২। গ	৩। গ	৪। খ		
পাঠ ৯.৫:	১। গ	২। ক	৩। গ	৪। খ	৫। ক	